শিক্ষা

সাজ্জাদুর রহমান

পাঠ্যপুস্তকে 'সমতাবিধান' করা গেছে কি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে (১৯৩২-১৯৩৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় বানান সংস্কার সমিতি'র বানান সংস্কারের প্রায় ৫০ বছরেরও অধিক সময় পর ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বাংলাদেশে প্রথম বাংলা বানান এবং টাইপ সংস্কার করে। এ দুই সংস্কারের মধ্যবর্তী সময়ে আরও অনেক সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হলেও নানা কারণে তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। এনসিটিবি 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতাবিধান' করতে গিয়ে এই সংস্কার করেছিল। সংস্কার কার্যক্রমে গৃহীত সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯২ সালে এনসিটিবি পাঠ্যবইয়ের বানান পুস্তকটি প্রকাশ করে। গৃহীত সুপারিশমালা এবং পাঠ্যবইয়ের বানান বইয়ের নিয়ম অনুযায়ী এনসিটিবি ১৯৮৮ সাল থেকে তাদের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ শুরু করে। ফলে সে সময় থেকে এনসিটিবির এক পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে আরেক পাঠ্যপুস্তকের এবং এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে এনসিটিবির বাইরে থেকে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনার বানানে 'অসমতা' সৃষ্টির সূচনা হয়।

সম্প্রতি পাঠ্যবইয়ের বানান পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্করণে এনসিটিবি তাদের পূর্বতন কিছু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আগের (১৯৮৮ সাল পূর্ববর্তী) বানান ও লিপিরূপ শেখানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এনসিটিবির এই সিদ্ধান্তের ফলে তাদের গৃহীত বানান ও টাইপের যৌক্তিকতা নির্ণয় এবং বাংলা বানানে সাম্প্রতিক নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান জরুরি হয়ে পড়েছে।

১. কেন্দ্রীয় বানান সংস্কার সমিতির নিয়ম ছিল, বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হবে (যেমন ক্লাস, পালিশ, পোশাক ইত্যাদি) এবং যেখানে শ ষ স লেখা হয় সেখানে তা-ই লেখা হবে। যেসব বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও সে অনুযায়ী বানান প্রচলিত আছে সেগুলো তেমনই থাকবে (যেমন কলেজ, টেবিল ইত্যাদি)। নবাগত বিদেশী শব্দের বানান যথাসম্ভব উচ্চারণ-অনুগ হবে (যেমন সীল-seal, ঈস্ট-east ইত্যাদি) এবং st স্থানে স্ট হবে।

এনসিটিবি এ নিয়ম পরিবর্তন করে অতৎসম শব্দ হলেই ি-কার এবং স্ট ব্যবহারের বিধান দেয় (প্রথম সংস্করণ, নিয়ম ৪.২ ও ১১) সে অনুযায়ী মাস্টার, খ্রিস্টাব্দ, খ্রিস্ট, খ্রিস্টান, পোস্ট অফিস লিখতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে "Christ ও Christian থেকে বাংলায় আত্মীকৃত (assimilated) বলে" খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টান শব্দ 'ষ্ট' দিয়ে লেখার বিধান দেয়া হয়েছে (১১.২.৭ সংখ্যক নিয়মে)। কিন্তু পোস্টমাস্টার আত্মীকৃত নয় আর খ্রিষ্টান আত্মীকৃত এটা নিরূপণের উপায় কী? তাছাড়া বিগত প্রায় ১৭ বছর ধরে যে কয়েক কোটি শিশু 'খ্রিস্ট, খ্রিস্টান' লিখে গেল তারা এই নতুন নিয়মের কথা কীভাবে জানবে? শিক্ষক, অভিভাবকই বা গত বছর 'খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টান' বানান শুদ্ধ নয় বলে এ বছর তাকে শুদ্ধ বলবেন কেমন করে?

২. প্রথম সংস্করণে বলা হয়েছিল 'প্রাচীন রূপ'(!) পরিহার করে কারচিহ্নগুলো সবসময় বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে (নিয়ম ১৫)। যেমন : গ্রু, হুকুম, রূপ, হৃদয় ইত্যাদি। নতুন সংস্করণে বলা হয়েছে, কারচিহ্নগুলোর 'প্রচলিত পুরাতন'(!) রূপটিও বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী 'পাঠশিখি'তে দেখানো আবশ্যক। যেমন : গু = গু, রু = রু ইত্যাদি।

প্রথমত, এই কারচিহ্ন তিনটির রূপ 'প্রাচীন' বা 'প্রচলিত পুরাতন' নয়। এগুলো সমকালীন। দ্বিতীয়ত, এনসিটিবি 'প্রাচীন' বা 'প্রচলিত পুরাতন' বলে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাতিল করার ১৭ বছর পর কেন তা 'আবশ্যক' বিবেচনা করছে?

৩. প্রথম সংস্করণে বলা হয়েছিল, যুক্তব্যঞ্জন 'যথাসম্ভব' স্বচ্ছ করতে প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লেখা হবে (নিয়ম ১৬)। নতুন সংস্করণে বলা হয়েছে, স্পষ্টীকরণের জন্য যে ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জনগুলো ভেঙে দেখানো হয়, সে ক্ষেত্রে ওগুলোর 'প্রচলিত পুরাতন'(!) রূপটিও 'পাঠশিখি' অংশে দেখানো 'আবশ্যক' এবং পাঠদানের সময় শিক্ষক এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন (পরিশিষ্ট গ)।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার সহকারী বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের ২ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় বানানসংস্কার সমিতি বানানসংস্কার করেছিল। কিন্তু এনসিটিবি কোনো ধরনের গবেষণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। আজ ১৭ বছর পরও তারা কোনো গবেষণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীরা যদি সারা বছর তাদের পাঠ উপকরণ ব্যবহার করে লিখে, পড়ে, দেখে, শিখে এবং শিক্ষকের 'কানমলা' খেয়েও যুক্তবর্ণের অস্বচ্ছ রূপটি না শিখতে পেরে থাকে তবে এখন শিক্ষকের একটু 'দৃষ্টি আকর্ষণেই' দুটো রূপ কীভাবে শিখতে পারবে? আর যদি

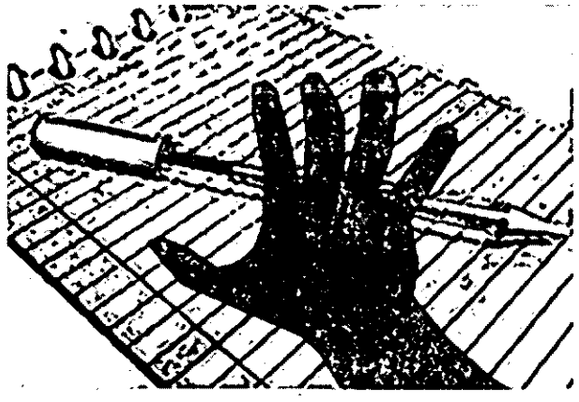

'পাঠশিখি'র অনুশীলনে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপের প্রতি শিক্ষার্থীর 'দৃষ্টি আকর্ষণ' করা হলেই তারা অস্বচ্ছ রূপটি শিখে যায় তবে যুক্তবর্ণের রূপ স্বচ্ছ করার প্রয়োজন কী ছিল?

৪. এনসিটিবির নিয়মে বলা হয়েছে, যেসব তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর দুইই সিদ্ধ সেসব ক্ষেত্রে শুধু হ্রস্বস্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন : পত্রাবলি, পদবি, পেশি, ভঙ্গি, শেফালি ইত্যাদি। তবে বহুলপ্রচলিত বলে অভরীক্ষ, গাভী, পল্লী, মারী, রানী, শ্রেণী এই শব্দগুলোতে (ই-কার সিদ্ধ হলেও) ঈ-কার ব্যবহার করা হবে (নিয়ম ৪.১)।

প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে নির্ধারণ করা যাবে পত্রাবলি, পদবি, পেশি, ভঙ্গি, শেফালি এই শব্দগুলো অভরীক্ষ, পল্লী, মারী, রানী, শ্রেণীর চেয়ে কম প্রচলিত? দ্বিতীয়ত, ি-কার এবং ী-কার 'দুইই সিদ্ধ' হলেও এই শব্দগুলো ি-কার দিয়েই লেখা হতো। বাংলা ভাষার সমস্ত দীর্ঘস্বরযুক্ত শব্দকে হ্রস্বস্বর করা গেলে বলা যেত যে শিক্ষার্থীদের আর ী-কার, -কার মনে রাখতে হবে না। কিন্তু তা যদি করা সম্ভব না হয় তবে যেসব শব্দ শতাব্দীকাল ধরে ী-কার, -কার দিয়ে লেখা হতো সেগুলোকে ি-কার, -কার করে কিসের 'সমতাবিধান' করা হল?

৫. এনসিটিবির নিয়মে বলা হয়েছে, অতৎসম অর্থাৎ অভব, দেশি, বেদেশি ও মিশ্র শব্দ হলেই ি-কার, -কার ব্যবহার করা হবে। যেমন- আজুদি, আমদানি, আসমানি, ইহুদি, গোঁসাপি, গ্রিক, জানুয়ারি, নানি, বাঙালি, রুপো, লাইব্রেরি, সভিন, সরকারি, স্টিমার, স্ট্রিট ইত্যাদি। তবে বহুলপ্রচলিত কিছু বিদেশী শব্দে (ই-কার সিদ্ধ হলেও) ঈ-কার ব্যবহার করা হবে। যেমন— ঈদ, একাডেমী, নবী, পরী, পীর, ফী, বীমা, জীপ, শহীদ, সাদী, স্পীকার (নিয়ম ৪.২)। কীভাবে বলা সম্ভব আমদানি-রপ্তানি বা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির চেয়ে একাডেমী, স্পীকার এসব শব্দ অধিক ব্যবহৃত হয়? আধিক্য-অনাধিক্যের নীতি বানান নির্ধারণের নিয়ামক হতে পারে কি? দ্বিতীয়ত, বানান অভ্যাসের বিষয়। ব্যুৎপত্তি মনে রেখে কোনো ভাষাভাষী মানুষ বানান লেখে না।

৬. বানানসংস্কার সমিতির নিয়মে ছিল, ট্রীসিস এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের শেষে ী-কার হবে, যেমন- মামী, বাঙালী, ফরাসী, সোনালী ইত্যাদি। এই ১টি নিয়ম থেকে এনসিটিবি ৩টি নিয়ম তৈরি করেছে, যার একটা হচ্ছে, -ইনী, -ঈ, -ঈয়সী, -ত্রী, -বতী, -বিনী, -মতী, -ময়ী ইত্যাদি(!) প্রত্যয়যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে (নিয়ম ৫)।

কিন্তু কেন হবে? 'ইত্যাদি'-র মধ্যে আরও কী কী প্রত্যয় আছে তা কীভাবে জানা যাবে? দ্বিতীয়ত, বানান সংস্কার সমিতির নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীবাচক শব্দ হলে নির্দ্বিধায় ী-কার ব্যবহার করা যেত। এখন মনে রাখতে হচ্ছে অমুক অমুক প্রত্যয় থাকলে ী-কার দিতে হবে আর বাকিগুলোতে 'ইত্যাদি'র ঝুঁকি বিবেচনা করে ি-কার দিতে হবে। এটা কোন অর্থে 'সমতাবিধান' বা 'সহজীকরণ'?

৭. বানানসংস্কার সমিতির নিয়মে ছিল, অসংস্কৃত অর্থাৎ অভব, দেশী, বিদেশী শব্দ হলেও যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে ণত্ব-ষত্ব বিধি বহাল থাকবে। যেমন ঠাণ্ডা, লণ্ঠন, খ্রীষ্ট ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বানান সহজ করার সরল পন্থা হচ্ছে প্রচলিত নিয়মের মধ্যে সর্বোচ্চ-সংখ্যক শব্দ অন্তর্ভুক্ত করানো; ইচ্ছেমতো নিয়ম তৈরি নয়। বানানসংস্কার সমিতি সেটিই করেছিল। কিন্তু এনসিটিবির নিয়মে বলা হয়েছে, তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ছাড়া কোথাও ণত্ব-ষত্ব বিধি অনুসরণ করা হবে না (নিয়ম ১২)। ফলে ণত্ব-ষত্ববিধি প্রয়োগ করে যেসব শব্দ সহজে শুদ্ধ করে লেখা যেত সেগুলোর এখন ব্যুৎপত্তি জানতে হচ্ছে, জানতে হচ্ছে, কোনটা আত্মীকৃত, কোনটা বহুল প্রচলিত ইত্যাদি।

এনসিটিবি ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারচিহ্ন যুক্ত হওয়া ৬টি টাইপ এবং ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জন ও তার সঙ্গে কারচিহ্ন যুক্ত ৩৬টি টাইপ মিলিয়ে মোট ৪২টি টাইপের রূপ পরিবর্তন করেছে। কিন্তু তারা সেই টাইপে লেখার উপায় উদ্ভাবন করেনি। এগুলো করেছে বিভিন্ন ব্যক্তি-উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান। তাই প্রবর্তনের ১৭ বছর পর এসেও বাংলা যতগুলো ফন্ট উদ্ভাবিত হয়েছে এককভাবে তার কোনো একটি ব্যবহার করে এনসিটিবির নির্ধারিত বানান লেখা সম্ভব নয়। সুতরাং শব্দে শব্দে, বাক্যে বাক্যে বারোমিশালী ফন্ট ব্যবহারের ফলে প্রযুক্তির গতি যেমন কমেছে, তেমনি মুদ্রণের জটিলতা বেড়েছে।

মনে রাখা দরকার, বাংলা ভাষা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আগে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে জড়িয়ে কার্যোদ্ধারের আমলাতন্ত্রীয় নানা কৌশল ও কর্মসূচির মতো 'বাংলা বানানের সমতাবিধান' কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল, যা আজ ভাষার শৃঙ্খলাকে নৈরাজ্যের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় বানানসংস্কার সমিতির সুপারিশ প্রমিত বাংলা বানানে স্থৈর্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এনসিটিবির সুপারিশ অন্যদের তথাকথিত বানানসংস্কারে ও নব নব বানানের নিয়ম সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে প্ররোচিত করেছে এবং বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, যাচ্ছেতাই বানানে বাংলা লিখতে ও ছাপাতে পরোক্ষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। এ ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, "শিশুদের এবং বর্ণজ্ঞানহীন বয়স্কদের দোহাই পাড়িয়া সব দেশেই ভাষা লিখনের জটিলতা বা হেরফের দূর করিবার কথা শুনা যায়, কিন্তু এদিকে কোনও প্রচেষ্টাই কার্যকর হয় না। সব জিনিস অতি-সোজা বা অতি-সহজ করিতে যাওয়া কাজের কথা নহে। দুরূহ বা কঠিন বস্তু কিছু-না-কিছু থাকিবেই— শিশু ও বয়স্কদের ভাষা-শিক্ষা কালে সেগুলি শ্রম করাইয়া আয়ত্ত করাইতে হইবে। ভাষা সমগ্র সমাজের জন্য, ইহাতে নিহিত উচ্চাবচকে সমভূম করিবার প্রয়াস বিফল হইবেই। শিশু ও বর্ণহীন বয়স্কদের প্রতি সহানুভূতির আতিশয্যে ভাষাকে নীচে নামাইয়া আনিবার চেষ্টার সার্থকতা দেখি না, বরঞ্চ শিশু ও অনুরূপ বয়স্কদেরই মনের পরিপূর্ণতা সম্পাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।...."

তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "... হাজার বা দুই হাজার বছর বা তাহারও অধিককাল ধরিয়া যে লিখন-ধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা হেলা-ফেলা করিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে।..."

প্রবাদ আছে, জালুকের হাতে খোড়া দিতে হয় না। সে যেখানে-সেখানে খুঁড়ে বেড়ায়। কিন্তু আধুনিক মুদ্রণপ্রযুক্তির খোড়া এখন সবার হাতে। তবে আর জালুক থেকে ভাষা রক্ষার উপায় কী!

সাজ্জাদুর রহমান : শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

ইত্তেফাক
তারিখ 07 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম